২৮-০৭-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - আগামী ২১ জন্মের জন্য রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত থাকতে চাইলে, বাবার শ্রীমত অনুসারে চলো। বাবার আসার কারণই হলো- তোমাদের সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করা।"

প্রশ্ন ১) :- তোমাদের সবচাইতে উঁচু লক্ষ্য কি ? যে পুরুষার্থ অনেক সময় ধরে করতে হয় ?

উত্তর :- অন্তিমকালে কেবল এক বাবার স্মরণে থাকা, যাতে আর অন্য কিছুই স্মরণে না আসে। এটাই কষ্টসাধ্য সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু যদি অন্য কেউ স্মরণে আসে, তবে আবার এই দুনিয়াতে জন্ম নিতে হবে। অতএব অনেক সময় ধরে শিববাবাকে স্মরণ করার অভ্যাসে অভ্যাসী হও।

প্রশ্ন ২) :- জ্ঞানে চলতে চলতে কোনও কোনও বাচ্চার মনের অবস্থা চঞ্চল ও অস্থির হয় - কেন ?

উত্তর :- যেহেতু তাদের নিশ্চয়তা পাকা হয় না। যখন নিশ্চয়তায় অভাব ঘটে, তখনই দোলাচল অবস্থায় উপর-নীচে হতে থাকে। কখনও অপার খুশী আবার কখনও বা খুশী হারিয়েই যায়।

গীত :- ভোলাবাবার মতন এমন অনুপম আর কেউই হয় না।

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা তো জানোই যে, তোমরা প্রত্যেকেই ভোলাবাবা শিবের সম্মুখে বসে আছো আর ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা এই সহজ-সরল রাজযোগের পাঠ গ্রহন করছো। সব বেদ-গ্রন্থ, উপনিষদ, গুরু গ্রন্থ সাহেব, ও ধর্ম-শাস্ত্রগুলির সার বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। এগুলি কেবল বি.কে-রা তাদের বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারে। চিত্রেও তা অঙ্কিত আছে, ব্রহ্মার দ্বারই এর সূচনা অর্থাৎ স্থাপনা হয়। তাই তো ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই সব ধর্মশাস্ত্র ও বেদ-গ্রন্থের সারগুলি শোনানো হয়। কিন্তু, প্রকৃত অর্থে কে তা শোনান ? -- পরমপিতা পরমাত্মা ভোলানাথ শিববাবা। যেহেতু উঁনি নিরাকার তাই সবকিছুই এই ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই বুঝিয়ে থাকেন। যাদেরকে উঁনি বোঝান, তারা আবার অন্যদেরকেও বোঝায়। আর যদি সে ঠিকমতন অন্যদের বোঝাতে না পারে, তার মানে সে নিজেই তা বোঝেনি অর্থাৎ সে অজ্ঞানী-নির্বোধ। অজ্ঞানীদের জ্ঞানী বানাবার জন্যই বাবা এভাবে বোঝাতে থাকেন। বাবা সব বাচ্চাকেই নির্বোধ বলে সম্বোধন করেন। বলেন, তোমরা কি এমন বাবাকেও চিনতে পারোনি ? পূর্বে তোমরা ভারতবাসীরাই তো সত্যযুগী স্বরাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্ব্বাদী-বর্সা নিয়েছিলে। কিন্তু যখন থেকে এই দুনিয়া রাবণ-রাজ্যে পরিণত হলো, তোমরা অধিকার সূত্রে পাওয়া সেই রাজ্য খুইয়ে ফেললে। সাথে সাথে রাবণ রাজ্য হবার কারণে তোমরা পতিত, নির্বোধ, কানা-কড়িহীন কাঙ্গালে পরিণত হলে। আর এখন তো গোটা দুনিয়াটাই অসুরী মত অনুসারেই চলছে। যাই হোক, এখন তো বুঝতে পেরেছো, কল্প পূর্বে বাবা ঠিক এই ভাবেই তোমাদের বুদ্ধিমান বানিয়েছিলন। যার ফলে কেবল তোমরাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়েছিলে। অথচ এখন তোমারা মায়ার দাসে পরিণত হয়েছো। কেবলমাত্র ধন-সম্পদেই নয়, সর্ব-প্রকার মায়া-রাবণেই। অর্থাৎ তোমরা এখন ৫-বিকারের শোক-বাটিকার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছো। সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই এখন রাবণ-রাজ্য। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মধ্যে, বিশেষ করে ভারতবর্ষই রাবণের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকার কারণে, তোমরা কেবল ভুল আর অন্যায় করেই চলেছো। তাই বাবা এসে সবাইকে সঠিক দিশা দেখান বলে,

একমাত্র ওনাকেই (বাবাকেই) ন্যায়বান সত্যবাবা পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। অপরদিকে রাবণকে অন্যায়কারী বলা হয়। শুরুর অর্দ্ধকল্প ন্যায়-নীতির রাজত্ব চলে, পরের অর্দ্ধকল্প চলে অন্যায় অনাচারের রাজত্ব। তাই তো রাবণের রাজত্বের সময়কে মিথ্যার দুনিয়া বলা হয়। কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো, জ্ঞানসাগর পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা এসব বোঝাচ্ছেন ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে। একথা তো প্রচলিতই আছে, মুহূর্তেই জীবনমুক্তি। এখানেও অনেকে বলে, মাত্র এক সেকেন্ডেই তো জীবনমুক্তি। কিন্তু এখন যে সবাই জীবন-বন্ধে আবদ্ধ হয়ে আছে, বিশেষ করে ভারতীয়রা। আর এই ভারতীয়রাই এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকে। যেহেতু তোমরা এখন ভগবান শিববাবার একান্ত আপন বাচ্চা। স্বয়ং ভগবান নিজেই তা বলেন, তোমরা (বি.কে-রা) তো আমার প্রকৃত বাচ্চা। তোমরা আরও জানো যে, ঈশ্বর স্বয়ং সেই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করান। আর তাই তো ওনাকে এই পতিত পুরোনো দুনিয়াতেই আসতে হয়। পুরোনো দুনিয়াকেই পতিত-ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া বলা হয়। যেহেতু সবাই ভগবানকে ডাকতে থাকে, হে ভগবান আমাদের জীবনমুক্তি দাও, এই দুঃখ-কষ্টের দুনিয়া থেকে মুক্ত করো। তারা তো জানে না এই দুঃখের দুনিয়া কখন থেকে শুরু হয় আর কে এর স্থাপনা করে। যদিও শাস্ত্র-পুঁথি পড়ে তারা অনেক বিদ্বান হয়। আবার এমন পুঁথি পড়া বিদ্বান-পণ্ডিতদের যথেষ্ট অহংকারও থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও এমন কেউ নেই যে অন্যদেরকেও জীবনমুক্ত করাতে পারে।

আর কেউ কিন্তু এমন ভাবে বলতে পারে না যে, আমি তোমাদের বা তোমাদের সবাইকে জীবনমুক্ত করিয়ে দিতে পারি। একমাত্র আমি (শিববাবা) তোমাদের সবার সদগতি করে থাকি-বিশেষ করে ভারতবাসীদের। তাই এই জয়গাঁথার কীর্ত্তনও করা হয়- পরমপিতা পরমাত্মাই সবার সদগতি দাতা, তিনিই সবার মুক্তিদাতা। একমাত্র তিনিই সবার দুঃখের নিবারণ করেন। কেউ কি আর সুখের নিবারণ করেন। দুঃখের নিবারণ করা- যা একমাত্র এই বাবা করেন। আচ্ছা, বলো তো- সুখের নিবারণ কে করেন ? যেখানে একদা ভারত এত সুখী ছিল। সেই সুখের নিবারণ করে ভারতকে এত দুঃখী কে বানালো ? --তোমাদের সেই সুখের নিবারণ ঘটালো রাবণ। আবার এখন রামের শ্রীমত অনুসারে চলে আগামী ২১-জন্মের জন্য তোমরা মুক্ত থাকতে পারবে, রাবণের হাত থেকে। একেই বলা হয় জীবনমুক্তি বা সদগতি। এবার তোমাদের বুদ্ধির মগজে তা ঢুকেছে তো! ভারত চিরকালই জীবনমুক্ত, যখন তা স্বর্গ-সুখের রাজ্য ছিল। সেই ভারতই এখন আবার দুঃখের রাজ্যে পরিণত হয়েছে যখন লোকেরা জীবনবন্ধে এসেছে। যদিও এটা অসীম বেহদের প্রশ্ন। বেহদের বাবা তো এমনই সব বেহদের কথা শোনাবে, যা না কি এই দুনিয়ার মানুষেরা তা জানেই না আদৌ। এমন কি তারা তো স্বর্গকেও জানে না, নরকেও জানে না। তারা কেবল এসবের কল্পনা করে মাত্র।

জীবনমুক্তও কেউ করাতে পারে না। যেহেতু বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট যা বহু পূর্বেই চিত্রাঙ্কন খোঁদিত করা থাকে, যার বিন্দুমাত্র পরিবর্তণ হয় না। আর এই নাটকের মুখ্য চরিত্রে থাকেন শিববাবা। যাকে সৃষ্টিকর্তা ও নির্দেশক বলা হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্টও করতে হয়। জগদম্বা যিনি, জগতের মাতা (মাম্মা) এবং জগত পিতা যিনি, জগতের পিতা (প্রজাপিতা ব্রহ্মা) - তাদেরও নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পার্ট অবশ্যই করতে হয়। দেবী-দেবতাদেরও কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে হয় এখানে। এছাড়াও ইসলাম, বুদ্ধ ইত্যাদিদেরও তাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ পার্ট অবশ্যই করতে হয়। যে যেমনটি করেছিল কল্প

পূর্বে। অবশেষে যা কেবল মাত্র একটা ধর্মে এসে দাঁড়াবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও নিজ নিজ সময়ে নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পার্ট পুনরায় আবার করতে থাকবে।

বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পেরেছো, বি.কে. ব্রাহ্মণকুলের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট এখন আবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণকুলের স্থাপনা চলছে, যাদের প্রকৃত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বলা যায়। যেমন ক্রাইস্ট-এর দ্বারা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের রচনা হয়। পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা ব্রহ্মা তারপর ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের রচনার ফলে এত অধিক সংখ্যায় মুখ-বংশাবলী (পোষ্য) ব্রাহ্মণ রচিত হয়। এই সম্প্রদায়ের জন্ম কোনও পতিত অর্থাৎ গর্ভ দ্বারা হয় না। যখন তোমরা অন্তর থেকে বলো, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা ..... এই পদ্ধতিতেই সবাই পোষ্য-সন্তান হয়। পোষ্য হবার ধরণটাই এমন। প্রথমে ব্রহ্মাকে পোষ্য নেওয়া হয়, তারপর ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের পোষ্য নেওয়া হয়। আর তোমরাও তা জানো, তোমরাই ব্রহ্মার বাচ্চা আর সেই সূত্রে শিববাবার নাতি-নাতনি। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়। এই সময়কালে কেবলমাত্র তোমরা বি.কে-রাই এখানকার পোষ্য হতে পারো। যা এখনও জারি আছে। পুরো কল্পে আর এরকম ভাবে পোষ্য নেওয়া হয় না। সাধু-সন্ন্যাসীরাও আবার পোষ্য নেয়, তারা তাদের অনুগামীদেরই পোষ্য নেয়। তারা সেই পোষ্যদের জানায়, তোমারা নিজেদেরকে কিন্তু অনুগামী বলবে না। যখন ঘর-সংসার ছেড়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করবে, একমাত্র তখনই তোমাদেরকে অনুগামী বলা যেতে পারে। আর এখানে তো তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ। সবাইকেই এই প্রকৃত সহজ রাজযোগের দিশা তোমাদেরকেই দেখাতে হবে। কিছু না কিছু অবশ্যই বোঝাতে হবে। যেমন, যেখানে মাত্র এক সেকেন্ডেই বাবার আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়, তেমনি অবশ্যই তোমরা পরমপিতা পরমাত্মা থেকে মুক্তি ও জীবনমুক্তির সেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেতে পারো। কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। যিনি সকল আত্মাদেরই পিতা অর্থাৎ শিব। ওনাকে স্মরণ করতে পারলেই, তোমরাও স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে পারবে। কিন্তু লৌকিক পিতাকে স্মরণ করলে স্বর্গের অধিকারী হওয়া যায় না। ঘর-সংসারে থেকেই শিববাবাকে স্মরণ করতে পারো তোমরা। আমরা আত্মারা শিববাবা পরমাত্মার সন্তান এই নিশ্চয় বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে।

বাবার প্রতি পুরোপুরি নিশ্চয়তা না আসার কারণেই স্থিতিতে চঞ্চলতা ও অস্থিরতা আসে। যেমন পারদ ওঠা-নামা করে। এই হয়তো খুব খুশীর পারদ চড়লো, পরমুহূর্তেই আবার তা ভুলেই গেলে। তাই তো বাবা এত করে বোঝাচ্ছেন, তোমাদের তো নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আবার এসে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। তোমরা তো এও জানো যে, তোমাদের পুনর্জন্মে আসতেই হয়। কিন্তু সাপের মতন পুনর্জন্মের প্রশ্ন নয়। সাপ তো তার পুরোনো খোলস ত্যাগ করে শরীরকে নতুন করে তোলে। যদিও তোমাদের শরীরেরও বদল হয়। তাই তো মানুষেরা যখন বুড়ো হয়, তারা ভাবতে থাকে, এবার তো যাবার পালা। তখন সে তার অন্তর-মনে দেখতে থাকে- এরপর আবার তো নতুন জন্ম নিয়ে বালক হতে হবে। তার এই জ্ঞান থাকে, এই শরীর ত্যাগ করার পর আবার যখন বালক হবো, তখন আবার সতোপ্রধান শরীর পাবো। পুরোনো শরীরকে জরাজীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু শরীর বলা হয়। তেমনি এই দুনিয়াও শুরুর দিকে নতুন অবস্থায় পরিপূর্ণ থাকে, যা ধীরে ধীরে তত্ত্বের সবকিছুতেই দিব্যতার মাত্রা কম হতে থাকে। চিত্রে যা চার-ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। জগতের লোকেরা কল্পের আয়ুকে অনেক বেশী করে বলে। তাই হিসেব মেলাতে গিয়ে তারা আত্মার ৮৪-লাখ যোনির কথাও বলে। তোমরাই সেই কল্পের আয়ুকে কত কম করে বোঝাও-যা যুক্তিগ্রাহ্যও

বটে। এবার বোঝো, এটাই কত দুঃখের। লাখ-লাখ বছরের হিসাব দেখাতে গিয়ে, তারা বোঝায় ৮৪-লাখ প্রকার যোনিতে জন্ম হয়। কিন্তু বাবা স্বয়ং এখানে বসে তার প্রকৃত তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে বোঝান। যেগুলি কখনও ভোলা উচিত নয় তোমাদের। যেমন ছাত্র কখনই তার শিক্ষককে ভুলতে পারে না। আর এক্ষেত্রে তো জানো, তোমরা ঈশ্বরীয় ঘরে বসে এই পাঠ পড়ছো। বাবার মুরলী নানা জায়গায় প্রতি সেন্টারেই শোনানো হয়। কিন্তু পাঠ পড়াচ্ছেন সেই একজনই যিনি জ্ঞানের সাগর। ওনাকেই আবার জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সবার সদগতিদাতা বলা হয়। এক্ষেত্র সর্ব অর্থাৎ ভারত সহ অন্যান্য সব দেশগুলিকেই বোঝানো হয়। যেহেতু তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, তাই ঈশ্বর শিক্ষক দ্বারা যত বেশী পড়াশোনা করবে, ততই উচ্চ-পদের অধিকারী হবে। অথচ, এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন কত সহজ-সরল। কেবলমাত্র দুটো শব্দকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে মনে গেঁথে রাখতে হয়। যাতে তোমরাও অন্যদেরকে বোঝাতে পারো, পরমপিতা পরমাত্মার বেহদের বাবাকে স্মরণ করলে তারাও বেহদের স্বর্গ-রাজ্যের সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারবে। ব্যস্, কেবলমাত্র এক এই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এ কথা তো প্রচলিতই আছে, অন্তিম সময়কালে যদি স্ত্রীকে স্মরণ করা হয় ..... তার জন্মও তবে সেই অনুসারেই হবে। তাই বাবা বার বার বলছেন, তোমাদের লক্ষ্য থাকবে অতি উচ্চ শিখরে। খুব সাবধানে নিজেকে সামলে রেখে সেই সিঁড়ি বেঁয়ে উপরের লক্ষ্যে এগোতে হবে। একে অপরকে সাবধান করতে থাকবে। সর্বক্ষণ শিববাবার স্মরণেই থাকতে হবে। বাবা বসে তার বাচ্চাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, লৌকিক জগতের গুরুদেরও উদ্ধার তো ওনাকেই করতে হয়, বি.কে. মাতাদের দ্বারা। মাতা-গুরু ছাড়া কেউ উদ্ধার হয় না। তাই তো মাতাদেরকেই নিমিত্ত বানানো হয়। এই মাতাদের মধ্যে জগদম্বা প্রধান মাতা। যার প্রভাবও অনেক। ব্রহ্মারও ততটা নেই। কেবলমাত্র পুষ্করেই ব্রহ্মার একটা মন্দির আছে। যেখানে আবার পুরুষেরাই বেশী যায়। কিন্তু অম্বা মাতার তো অনেক মান-সন্মান। যেখানে-সেখানেই দেবীদের মন্দিরের সামনে কত মেলাও বসে। গুরুদের মত অনুসারে চলে তোমরা তো অনেক ঠেলা-ধাক্কাই খেয়েছো-কিন্তু তাতে তোমাদের লাভই বা কি হয়েছে ? -- কিছুই না। দিব্যতার মাত্রা কম হতে হতে, ভারতকে তো পতিত অবস্থায় আসতেই হবে। অথচ, ঘরে (আত্মাদের ঘর) ফিরে যেতে পারে না কেউ। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, জগতের প্রতিটা মানুষেরই অবস্থা অপবিত্র-পতিত, জরাজীর্ণ। জগতের প্রত্যেককেই এর মধ্যে ধরতে হবে। তাই তো বর্তমান দুনিয়ার মানুষদের এত দুঃখ-কষ্ট। প্রতিটি মুহূর্তেই এক পা-এক পা করে সেই দুঃখ ক্রমে-ক্রমে আরও বেড়ে চলেছে।

বাচ্চারা, তোমরা যদিও বা বুদ্ধিমান-বুঝদার হয়েছো, কিন্তু অন্যেরা তো এ বিষয়ে একেবারেই নির্বোধ। তারা (আত্মারা) তো নিজেদের বাবা পরমাত্মাকেই জানে না। যদিও তারাই আবার বলে, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা। অর্থাৎ যিনি স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, তার উদ্দেশ্যে। পূর্বে কখনও নিশ্চয় এমনটাই হয়েছিলো-তাই তো ওঁনার স্মরণেই এমন গীত গাওয়া হয়। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে, আবার সেই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা কার্য শুরু হয়েছে। যখন স্বর্গ-রাজ্য থাকে, তখন অন্য আর কোনও ধর্মের অস্তিত্বও থাকে না। আর এখন যেমন অন্যান্য অনেক ধর্ম রয়েছে, কিন্তু সেই ধর্মের (আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম) এখন আর অস্তিত্বই নেই। অর্থাৎ ধর্মের ভিতটাই নেই। (তোমাদের দ্বারাই) আবার এখন সেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কার্য শুরু হয়ে গেছে। আগামী অর্দ্ধ-কল্প পর্যন্ত আর অন্য কোনও ধর্মের প্রকাশ ঘটবে না। ততদিন কেবলমাত্র এই একটি ধর্মই থাকবে। সেই অর্দ্ধ-কল্পে থাকবে সূর্য-বংশীয় ও চন্দ্র-বংশীয়দের স্বরাজ্য। একমাত্র তোমাদেরই এই ঈশ্বরীয় জন্ম-সিদ্ধ অধিকার। যে জন্ম-সিদ্ধ অধিকার পেয়ে থাকো একমাত্র স্বর্গীয়

ঈশ্বরীয় পিতার থেকে। তাই তোমরা নিজেরাই তোমাদের স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনা করছো। আর রাজ্য ভোগ করার জন্য নিজেদেরকেও তার উপযুক্ত করে তুলছো। তিনিই একমাত্র পরম শিক্ষক যিনি তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে উপযুক্ত করে তুলছেন। রোজ রোজ এত ভাবে বুঝিয়ে চলেছেন, তোমাদের ধারণায় দৃঢ়তা আনার জন্য। সতর্ক করে তিনি বলছেন, মায়া কিন্তু তোমাদেরকে স্মরণের যোগে বাধা দেবে। তুমি যতই চেষ্টা করবে, মায়া ততই বাধার সৃষ্টি করবে। বাবাকে স্মরণ করতে গেলে এই ভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকে। তাই বাবা স্বয়ং বসে সে বিষয়ে বোঝাচ্ছেন তোমাদের কি কি করতে হবে। তোমরা কিন্তু কর্মযোগীও। হ্যাঁ, ঘর-সংসারের বাচ্চারা তোমাদের জ্বালাতনও করে। যেহেতু জগৎটাই এখন ভয়ঙ্কর নরকে পরিণত হয়েছে। তাই সন্তানই নিজের মাকেও দুঃখ-কষ্ট দেয়। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যের সন্তানেরা মায়েদের কেবল সুখই দিয়ে থাকে। যেহেতু সেটা সুখধাম। সেখানে কোনও বস্তুও এমন হয় না যে, যার দ্বারা দুঃখ আসতে পারে বা যা ভেজাল হতে পারে। আর এখানে দেখো কতই না দুঃখ। কত আজে-বাজে নোংরা-নোংরা অসুখ-বিসুখও হয়। পূর্বে যা ছিল না। যেমন ক্যান্সার রোগের নাম আগে কেউ শোনেইনি। স্বর্গ-রাজ্যে রোগ-শোকে ঘটেই না। যখন থেকে আসুরী-রাজ্য শুরু হয়, তখন থেকেই যত সব নোংরা রোগ-অসুখ হতে থাকে। অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে যা বহু পূর্ব থেকেই খোঁদিত হয়ে আছে। স্বর্গ-রাজ্যের গরুগুলিকেও কত সুন্দর দেখতে লাগে। লোকশ্রুতি আছে, কৃষ্ণের কাছে অতি সুন্দর সুন্দর গরু থাকতো। যে কারণে কৃষ্ণকেই গোয়ালা বলে প্রচার করেছে। কিন্তু, বাস্তবে কৃষ্ণ কি গোয়ালা ছিল ? - মোটেই নয়। বরঞ্চ তোমরা বলতে পারো শিববাবা এই গরুতুল্য চৈতন্য মানুষদেরই জ্ঞানের মাঠে চড়িয়ে জ্ঞনের ঘাস খাওয়াচ্ছেন। আর জ্ঞানের কলস মাতাদের মাথার উপর রেখেছেন। বাবা বলছেন, এবার উনি যা শোনাবেন, তা সবাই মনোযোগ সহযোগে শোনো। "প্রথমতঃ তোমাদের সবাইকে মনমনা ভবঃ হয়ে থাকতে হবে। কেবলমাত্র ওনাকে স্মরণ করলেই আত্মার বিকর্মগুলি ভষ্ম হয়ে যাবে। যা খুবই সহজ,সরল উপায়।" আচ্ছা

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণের-ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার শ্রীমত অনুসারে, সবাইকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে জীবনমুক্তির আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়াবার সেবা করতে হবে।

২) একমাত্র বাবার কথাই শুনতে হবে। এছাড়া যা যা শুনেছো, সবকিছুই ভুলে যেতে হবে। তোমাদের লক্ষ্য যেখানে অতি উচ্চ ও কঠিন, তাই একে অপরকে সাবধান করতে থাকবে ও বাবার কথা মনে করাতে করাতে উন্নতির শিখরে
পৌঁছতেই হবে।

বরদান :- উৎসাহ-উদ্দীপনার আধারে সদা উড়তী-কলার অনুভবকারী হিম্মৎবান হও

বিস্তার :- উড়তী কলার অনুভব করার জন্য হিম্মৎ আর উদ্যম-উৎসাহের ডানা দরকার। কোনও কার্যে সফলতা পাবার জন্য উদ্যম-উৎসাহ খুবই দরকার। উদ্যম-উৎসাহ যদি

না থাকে, তবে সেই কার্যে সফলতাই আসে না। কারণ উদ্দ্যম-উৎসাহ না থাকলে, তখন ক্লান্তি অনুভব হবে, আর ক্লান্ত হলে সেই কার্য সফলও হয় না। অতএব হিম্মৎবান হয়ে উদ্দ্যম আর উৎসাহের আধারে উড়তে থাকলে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

স্লোগান :- অপরকে সাহায্য করা আর আশীর্ব্বাদ পেতে থাকা - এটাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।